Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭

৪০ বর্ষ ৭ সংখ্যা ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭, সোমবার, ১ ফাল্গুন, ১৪২৩

রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প সংস্থা রক্ষার শপথ নিল দুর্গাপুরের মানব-বন্ধন

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর, ১২ ফেব্রুয়ারি : ট্রেড ইউনিয়ন সমূহের যৌথ মঞ্চের ডাকে ১১.০০ থেকে ১১.১৫ পর্যন্ত ইস্পাতনগরীর কেন্দ্রস্থলে এ-জোনের ড. বিধানচন্দ্র রায়ের মূর্তির পাদদেশ থেকে বি-জোন স্বামী বিবেকানন্দ মূর্তির পাদদেশ পর্যন্ত মানব-বন্ধনের কর্মসূচি পালিত হল।

বিগত এন.ডি.এ সরকারের আমলে রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানা ধ্বংসের অভিযানে দুর্গাপুরে এম.এ.এম.সি, ফার্টিলাইজার (এফ.সি.আই), বি.ও.জি.এল সহ ৬টি রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানা বন্ধ হয়ে যায়। সেই সময়ে মন্ত্রীসভায় ছিলেন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু তিনি কোনো উদ্যোগই গ্রহণ করেননি। উপরন্তু রাজ্যের বিগত বামফ্রন্ট সরকারের এম.এ.এম.সি. পুনরুজ্জীবনের জন্য কনসোর্টিয়াম গঠনের উদ্যোগকে ঠাণ্ডা ঘরে পাঠিয়ে দিয়েছে বর্তমান তৃণমূল সরকার। দুর্গাপুরে আবার রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানার ‘নিধন-যজ্ঞ’ শুরু করার প্রচেষ্টা নিয়েছে কেন্দ্রের মোদি ও রাজ্যের মমতা সরকার। দেশের ‘মহারত্ন’ রাষ্ট্রায়ত্ত ইস্পাত উৎপাদনকারী সেইল-এর অন্যতম হেরিটেজ কারখানা অ্যালয় স্টিল প্ল্যান্ট বন্ধ করার ষড়যন্ত্র চলছে। বিপন্ন সেইল-এর অপর অন্যতম দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্ট, দুর্গাপুর থার্মাল পাওয়ার স্টেশন (ডি.টি.পি.এস.) এবং ডিভিসি-র অন্তর্গত দুর্গাপুর ব্যারেজ তথা দুর্গাপুরের শিল্প ও পানীয় জলের সরবরাহ। কিন্তু রাজ্যের তৃণমূল সরকার এ বিষয়ে নিশ্চুপ। রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানার ‘নিধন-যজ্ঞ’এ কেন্দ্রের মোদি সরকারের অন্যতম দোসর হয়ে উঠেছে রাজ্যের মমতা সরকার। রাজ্য পরিচালনাধীন ৯০টি রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানা সঙ্কুচিত করে ৪৬টি সংস্থায় পরিণত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দুর্গাপুর কেমিক্যালস। চরম বিপন্ন তাপ বিদ্যুৎ উৎপাদন সংস্থা ডিপিএল। ৬টি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা সহ বন্ধ হয়েছে মোট ২২টি কারখানা। লক্ষ লক্ষ মানুষ কাজ হারিয়েছে। বিপন্ন দুর্গাপুর জনপদ। ভয়ংকর বিপদ ঘনাচ্ছে রাজ্যের

—এরপর চারের পাতায়

জমায়েত, মিছিল, স্মারকলিপি কালনায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১০ ফেব্রুয়ারি : সকলকে ডিজিটাল রেশনকার্ড, গরিব মানুষকে দুটাকা কেজি দরে চাল, নিয়মিত ভাতা প্রদান সহ সাত দফা দাবিতে উত্তাল কালনা। সারা ভারত কৃষকসভার কালনা ২ নং থানা কমিটির উদ্যোগে এদিন জমায়েত, মিছিল, স্মারকলিপি প্রদান কর্মসূচি সংগঠিত হয়। সিঙ্গারকোন হাটতলায় জমায়েতের পর মিছিল করে কালনা-২ নং বিডিও অফিসের গেটে এলে পুলিশ আটকায়। ক্ষোভে ফেটে পড়ে সাধারণ মানুষ। জোর করে তারা বিডিও দপ্তরে ঢুকে পড়ার চেষ্টা করে। পুলিশ বেগতিক দেখে বিডিও অফিসের গেটে ভিতর থেকে তালা লাগিয়ে সেখানে আশ্রয় নেয়। শেষে কৃষক নেতৃত্ব ও পুলিশের মধ্যে আলোচনার পর সাধারণ মানুষের ক্ষোভ প্রশমিত হয়। পুলিশ নির্বিঘ্নে স্মারকলিপি প্রদান করার ব্যবস্থা করে। কাজী নুরুল ইসলাম, গোপাল মণ্ডল, অশোক ঘোষের নেতৃত্বে ১২ জনের একটি প্রতিনিধি দল বিডিওকে স্মারকলিপি প্রদান করে। বক্তব্য রাখেন কৃষক নেতা মহম্মদ আলী।

বিডিওকে ডেপুটেশন রানিগঞ্জে

নিজস্ব সংবাদদাতা, রানিগঞ্জ, ৭ ফেব্রুয়ারি : সিপিআই(এম) রানিগঞ্জ জোনাল কমিটির পক্ষ থেকে সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের কাছে সমস্ত মানুষকে ডিজিটাল রেশন কার্ড দেওয়া, রেশনে বরাদ্দ না কমানো, ভুল-ত্রুটিমুক্ত রেশন কার্ড দেওয়া, বিধবা-বার্ধক্য ভাতা সহ অন্যান্য সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পগুলির সুবিধা গরিব মানুষদের প্রদান করা, একশো দিনের কাজ সর্বত্র চালু করা, একশো দিনের পরিবর্তে দুশো দিনের কাজ দেওয়ার পাশাপাশি মজুরি তিনশো করার দাবি, পঞ্চায়েতে ব্যাপক দুর্নীতি রোধ, রাস্তা ও বিদ্যুৎ পরিষেবাকে উন্নতকরা ইত্যাদি দাবিতে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। রানিসায়ের মোড়ে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন বিধায়ক ও শ্রমিক নেতা হারাধন ঝা, দেবিদাস ব্যানার্জী, আজাদীপ্রসাদ, কিশোর ঘটক, দিব্যেন্দু মুখার্জী, হেমন্ত প্রভাকর, পূর্ণদাস ব্যানার্জী ও সঞ্জয় প্রমানিক প্রমুখ। দেবীদাস ব্যানার্জীর নেতৃত্বে আট জনের এক প্রতিনিধি দল বিডিও-র সাথে দেখা করে দাবিসনদ দেন। বিডিও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন। প্রায় পাঁচ শতাধিক মানুষ সমাবেশে হাজির হন। আগামী দিনে তাঁরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, নতুন রেশন কার্ড, বন্ধ কলকারখানা খোলা, বিদ্যুতের মাশুল বৃদ্ধি সহ বিভিন্ন দাবিতে আগামী ১৩ ফেব্রুয়ারি আসানসোল কর্পোরেশন অফিসে ডেপুটেশন সংগঠিত হবে। রানিগঞ্জের সর্বত্র তার প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে।

২৯তম জেলা বইমেলা ধাত্রীগ্রামে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৮ ফেব্রুয়ারি : ৮ ফেব্রুয়ারি বুধবার থেকে শুরু হয়েছে বর্ধমান জেলার কালনার ধাত্রীগ্রামে ২৯তম জেলা বইমেলা। মেলা চলবে ১৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন চলচ্চিত্র পরিচালক শতরূপা সান্যাল। প্রতিদিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আলোচনা সভা হয়েছে। মেলায় ৬৫টি প্রকাশনা সংস্থা এসেছেন।

পোস্টার, লিফলেট, ফ্ল্যাগ, ফেস্টুন, বড় বড় তোরণ নির্মাণ করে বইমেলার প্রচার চালানো হয়েছে বইমেলা শুরু হবার আগে থেকে। পোস্টার লিফলেটে ২৯তম কথাটি বাদ দিয়ে কেবল বর্ধমান জেলা বইমেলা লেখা হয়েছে। এই বিষয়ে অভিজ্ঞমহল মনে করছেন যে, ‘‘বামফ্রন্ট-এর আমলে যে জেলা বইমেলা শুরু হয়েছিল তা মানুষকে জানাতে চায় না বলেই এই কাজ করেছে বর্তমান শাসক দল। ‘সরকার পরিবর্তনের’ ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে চরম নৈরাজ্য নেমে এসেছে তাও আর চাপা দেওয়া গেল না—একথা উঠে এল উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কোনো সাহিত্যিক উপস্থিত ছিলেন না। বইমেলা ঘিরে বিভিন্ন রকম মন্তব্য উঠে এসেছে, নানা মত শোনা গেছে। কালনা ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি

—এরপর চারের পাতায়

আদিবাসী নেতার নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে উত্তাল বর্ধমান

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৮ ফেব্রুয়ারি : আদিবাসী নেতাসহ মিথ্যা মামলায় যুক্ত সকলের নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে উত্তাল হলো বর্ধমান। প্রায় দশ হাজার মানুষ এদিন বর্ধমান স্টেশন থেকে মিছিল করে আদালত চত্বরে সমবেত হন। প্রধান দাবিগুলি ছিল আদিবাসী নেতা সুরেন হেমব্রমসহ মিথ্যা মামলায় যুক্ত সকলের নিঃশর্ত মুক্তি চাই। স্কুলের জায়গায় বেআইনি নির্মাণ বন্ধ করতে হবে। আউসগ্রামের ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত করতে হবে।

আদিবাসী, মানুষদের উপর পুলিশি জুলুম, অত্যাচার বন্ধ করতে হবে এবং বাড়ি ভাঙচুর ও লুটপাটের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। আদালত চত্বরে নেতাজী মূর্তির সামনে একটি সভা হয়।

পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী অধিকার মঞ্চ ও পশ্চিমবঙ্গ সামাজিক ন্যায় মঞ্চের বর্ধমান জেলা কমিটির উদ্যোগে এই সভায় পুলিন বাস্কে, মনসা হাঁসদা, রবীন টুডু, সনাতন টুডু, বিনয় হাঁসদা ও তমাল মাজি বক্তব্য রাখেন। বক্তারা সাজানো মিথ্যা মামলায় সুরেন হেমব্রমের গ্রেপ্তারের তীব্র প্রতিবাদ জানান। বলেন, তাঁকে নিঃশর্তভাবে মুক্তি না দেওয়া হলে রাজ্য জুড়ে বৃহত্তর আন্দোলন শুরু হবে। তাঁরা কেন্দ্রে বিজেপি ও রাজ্যের তৃণমূল উভয় দলেরই আদিবাসী স্বার্থ বিরোধী কাজের সমালোচনা করেন। বলেন, দুই শক্তির বিরুদ্ধেই মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে লড়তে হবে আমাদের।

দুটি সংগঠনের পক্ষ থেকে অতিরিক্ত জেলা শাসকের কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। ধামসা-মাদলের নাচ এবং গানের মধ্য দিয়ে আদিবাসী ও শ্রমজীবী মহিলারা দলে দলে এই মিছিলে উপস্থিত ছিলেন। সভা মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন পুলিশের মিথ্যা মামলায় ধৃত আদিবাসী নেতা সুরেন হেমব্রমের স্ত্রী উর্মিলা হেমব্রম।

আলোচনা : পশ্চিমবঙ্গে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাটোয়া : পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে প্রতিমুহূর্তে যে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে, তা আরো একবার প্রকাশ পেল, কাটোয়া কলেজের সেমিনার কমিটি আয়োজিত এক আলোচনাসভায়। ‘‘হিউম্যান রাইটস : ইন্টার ডিসিপ্লিনারি পার্সপেকটিভ’’ শিরোনামে আয়োজিত সারাদিনব্যাপী এই অ্যাকাডেমিক আলোচনাসভায় বক্তরা ছিলেন এই মুহূর্তের রাজ্যের পরিচিত কয়েকটি কণ্ঠ। রাজনৈতিক বিশ্লেষক তথা রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক ড. বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক তথা ‘নেতাজি ইন্সটিটিউট অব এশিয়ান স্টাডিজ’-এর অধিকর্তা ড. অপূর্বকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের মানবাধিকার বিষয়ের অধ্যাপিকা ড. পায়েল রায়চৌধুরী ও লেখিকা ও সমাজকর্মী জয়া মিত্র। আলোচ্য বিষয়ে বলতে গিয়ে প্রত্যেকে এই মুহূর্তে রাজ্যে মানবাধিকার লঙ্ঘনের কথা উল্লেখ করেন। রাজ্যে, দেশে, বিশ্বে যখন মানবীবিদ্যা চর্চা বা মহিলাদের আরও অধিকার দেওয়ার কথা উঠছে, তখন রাজ্যে মহিলাদের দুর্দশা বাড়ছে। প্রায় প্রতিদিন কোনো না কোনো প্রান্তে মহিলারা ধর্ষিতা হচ্ছেন। পৃথিবীর প্রাচুর্য বাড়ছে, অথচ বৈষম্যের শিকার হচ্ছে বৃহত্তর আর একটি অংশ।

ড. অপূর্ব মুখোপাধ্যায় বলেন, প্রতিদিন ১৪০০ শিশু পৃথিবীতে অনাহারে বা অপুষ্টিতে মারা যাচ্ছে, অথচ এক শ্রেণির মানুষ প্রাচুর্যের মধ্যে খাদ্য নষ্ট করছে। আজ তৃতীয় প্রজন্মের মানবাধিকারের অঙ্গনে দাঁড়িয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের ভাবার আহ্বান জানান

—এরপর চারের পাতায়

পেঁয়াজ বীজ কৃষকদের হাতে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১১ ফেব্রুয়ারি : ধান পাট আলু সহ সমস্ত ফসলের বীজ উৎপাদন করার দায়িত্ব বহুজাতিক সংস্থার হাতে চলে গেছে। কিন্তু পেঁয়াজের বীজ উৎপাদন করার ক্ষমতা কৃষকরা নিজেদের হাতে রাখতে সক্ষম হয়েছেন। সেই ছবি দেখা গেল কালনায়। পাঁচটি ব্লকে যোলশো হেক্টর জমিতে শীতকালীন সুখসাগর প্রজাতির পেঁয়াজ চাষ হচ্ছে। সাধারণত এই পেঁয়াজ ওঠে মার্চ মাসের প্রথম দিকে, সংরক্ষণ করা যায় সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত। তারপর ভিন রাজ্যের দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়। দাম দিতে হয় বেশি। পঞ্চাশ ষাট টাকা কেজি দরেও পেঁয়াজ কিনে খেতে হয়েছে এ

—এরপর চারের পাতায়

নতুন চিঠি

১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭

হায় বাঙালি, হায়!

বাঙালি তথা ভারতবাসীর গর্বের মুখে কাদা ছিটিয়ে, রাজনৈতিক আচরণ কোন কদর্য পর্যায়ে নামতে পারে তার অনন্য উদাহরণ সৃষ্টি করে নিজেকে ধিক্কারেরও অযোগ্য বলে প্রমাণ করলেন বিজেপি-র মহামহিম রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। নোবেলজয়ী, ভারতরত্ন, বিশ্ব-মনীষার জগতে বাঙালির গর্ব ও মর্যাদার প্রতীক অমর্ত্য সেনকে তিনি যে কদর্য ভাষায় কার্যত গালাগালি করলেন, তাতে বড়কে ছোট করতে গিয়ে নিজে যে কতটা ছোট সেটাই তিনি প্রমাণ করলেন। দলীয় এক সভায় ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি অবলীলায় বলে গেলেন, অমর্ত্য সেন কী করে নোবেল পুরস্কার পেলেন, তা বাংলার কেউই নাকি বোঝেন না। অমর্ত্য সেন নিজেও বোঝেন কিনা সন্দেহ আছে। তার প্রশ্ন, অমর্ত্য সেন কী দিয়েছেন দেশকে, কী করেছেন? দিলীপবাবু নাকি এটা ভেবে বিস্মিত যে মেরুদণ্ডহীন, চরিত্রহীন মানুষদের একজন—যাদের কেনা যায়, বিক্রি করা যায়, চমকালেই যে পায়ে পড়ে যায়—এরকম একজনের জন্য বাঙালি কী করে গর্বিত হতে পারে!

সত্যিই, ধর্মের নামে ঘৃণা ও হিংসার রাজনীতিই যার একমাত্র রাজনৈতিক উপজীব্য, তার কাছে এর চেয়ে উন্নত মানসিকতা আর কী প্রত্যাশা করা যায়। নোবেল পুরস্কারের বিশ্বস্বীকৃতির কথা না হয় বাদই দেওয়া গেল, দিলীপবাবুর বোধ হয় স্মরণে নেই যে তারই দলের প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ির শাসনকালেই অমর্ত্য সেন ভারতরত্ন উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। আজ এই দলেরই আর এক প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেখতে চান না বলায় সেই অমর্ত্য সেনকেই কদর্য ভাষায় আক্রমণ করলেন বিজেপি ও আর এস এস-এর ধ্বজাধারী এমন এক নেতা, যিনি তাঁর পদনখকণারও যোগ্য নয়। সত্যিই এটা বাঙালির লজ্জা।

প্রসঙ্গত আর একটি বিষয়ও উল্লেখ করতে হয়। দিলীপবাবুর এই হীন উক্তির প্রতিবাদে কতিপয় বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিক অল্প-বিস্তর সোচ্চার হলেও, আরও বড় প্রতিবাদ কি প্রত্যাশিত ছিল না? খুন-ধর্ষণ ইত্যাদির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণে সদাব্যস্ত মিডিয়াও এ-বিষয়ে যতটা সোচ্চার হওয়া উচিত ছিল, তেমনটা কি হয়েছে? বাঙালি কি সত্যিই 'আত্মবিস্মৃত' জাতির তকমাকেই সত্য প্রমাণ করতে চাইছে?

সিপিআই(এম) তহবিলে দান

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি ১১ ফেব্রুয়ারি : অবসরপ্রাপ্ত স্কুল শিক্ষক জয়দেব ঘোষ তাঁর অবসরকালীন প্রাপ্ত অর্থ থেকে ৩০ হাজার টাকা দান করলেন। সিপিআই(এম)-কে। মেমারিতে জোনাল দপ্তরে এসে দলের বর্ষীয়ান নেত্রী মহারানি কোঙারের হাতে তিনি ৩০ হাজার টাকার চেক তুলে দেন। তাঁর সাথে ছিলেন স্ত্রী পূর্ণিমা ঘোষ। তাঁর বাড়ি মেমারির তাতারপুরে।

এন. ইউ.জে-এর ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ১১ ফেব্রুয়ারি : এন. ইউ.জে-এর বর্ধমান পূর্ব শাখার উদ্যোগে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে এক স্মারকলিপি দেওয়া হয় জেলা তথ্য সাংস্কৃতিক আধিকারিককে। উল্লেখযোগ্য দাবিগুলির অন্যতম তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের মাধ্যমে জেলার সংবাদপত্রে রাজ্য সরকারে বিভিন্ন প্রকল্পের বিজ্ঞাপন। জেলার পত্র-পত্রিকা জন্য বিজ্ঞাপনের বাজেট বৃদ্ধি, সরকারি অ্যাক্রিডিয়েশন কার্ড, টোল প্লাজায় সরকারি পরিচয়পত্র থাকা সাংবাদিকদের বিনামূল্যে যাতায়াতের সুযোগ প্রভৃতি। এদিনই তাঁরা বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যকেও একটি স্মারকপত্রে সাংবাদিকদের জন্য কিছু দাবি দাওয়া পেশ করেন। উপস্থিত ছিলেন নিরুপম চৌধুরী, শান্তনু সেনশর্মা, প্রসেনজিৎ সামন্ত, প্রবীর চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

এক ডজন প্রশ্ন

১. অক্সিজেন গ্যাস কে আবিষ্কার করেন? কবে তাঁর মৃত্যু হয়?
২. নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি কবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল?
৩. কালাজ্বারের প্রতিষেধক আবিষ্কারক কে ছিলেন? তাঁর কবে মৃত্যু হয়?
৪. আমাশয় রোগের 'শিগেলা' কে আবিষ্কার করেন? তাঁর কবে জন্ম?
৫. বিকর্ণ কোন সাহিত্যিকের ছদ্মনাম? কবে তাঁর মৃত্যু হয়?
৬. ভারতের ভাইসরয় লর্ড আর্ল অফ মেয়ো কবে কোথায় কার হাতে মৃত্যু হয়? তাঁর কবে ফাঁসি হয়?
৭. নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?
৮. কোন সাহিত্যিকের ছদ্মনাম বনফুল? তার কবে মৃত্যু হয়েছিল?
৯. প্রবীণ কমিউনিস্ট তথা কৃষক নেতা রামনারায়ণ গোস্বামী কবে কোথায় প্রয়াত হন? তাঁর জন্ম কবে হয়েছিল?
১০. এক্সরে কে আবিষ্কার করেন? কবে তাঁর মৃত্যু হয়?
১১. কে গ্রামোফোন আবিষ্কার করেন? তাঁর কবে জন্ম হয়েছিল?
১২. বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য কে ছিলেন? তিনি কবে কোথায় জন্মান?

(উত্তর শেষের পাতায়)

বিচিত্র রাজ্য বাজেট

ভাস্কর গোস্বামী

বিরোধীশূন্য বিধানসভায় ২০১৭-১৮ অর্থবর্ষের রাজ্য বাজেট পেশ করলেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র। এক নজিরবিহীন ঐতিহাসিক বাজেটের সাক্ষী থাকলেন রাজ্যবাসী। বাজেটে প্রায় অধিকাংশ জুড়ে থাকলো বিমুদ্রাকরণের জুজু। প্রায় ৫ লক্ষ কোটি টাকার। যার ফলে রাজ্যে বৃদ্ধির হার কমে ৯.২৭ শতাংশ হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন অমিত মিত্র। একই সঙ্গে অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন যে চলতি অর্থবর্ষে রাজস্ব খাতে ১০ শতাংশ আয় বেড়েছে। যার ফলে আগামী অর্থবর্ষে কর আদায়ের লক্ষমাত্রা ৫৫ হাজার ৭৮৬ কোটি টাকা ধরা হয়েছে। কারণ নোট বাতিলের ফলে এক ধারে রাজ্যের বৃদ্ধি হার কমেছে ৯.২৭ শতাংশ, আবার এর সাথেই রাজস্ব খাতে আয় বাড়ছে ১০ শতাংশ। কী করে হয় তা বোধগম্য হয় না।

নোট বাতিলের কারণে কাজ হারানো শ্রমিকদের জন্য ৫০ হাজার টাকার আর্থিক সাহায্যের কথা ঘোষণা করেছেন অর্থমন্ত্রী। এই সাহায্য শুধুমাত্র এই রাজ্যে কাজ হারানো শ্রমিকদের জন্য নয়, ভিন রাজ্যর শ্রমিকদের জন্যেও প্রযোজ্য। এই প্রথম রাজ্য বাজেট রাজ্যের সীমানা ছাড়িয়ে ভিন রাজ্যগুলির জন্য কিছু করার কথা ভাবলো। এইক্ষেত্রে এই ঘোষণা কার্যকর করা প্রায় অসম্ভব। পাশাপাশি নোট বাতিলের জেরে ৫০ হাজার কর্মহীন শ্রমিকদের পাশে দাঁড়ানোর প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলো এই বাজেটে। কিন্তু যেটা জানানো হলো না, কীভাবে পাশে দাঁড়ানো যায় এই কর্মহীন শ্রমিকদের। চপ-শিল্প না আচার-শিল্পে এই কর্মহীনদের নিযুক্ত করে!

সমবায় ঋণে ১০০ কোটি টাকার বিশেষ অর্থবিল তৈরি করবে রাজ্য সরকার। এই তহবিলের সুবিধা পাবে নোট বাতিলের ফেরে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক। এমনি দাবি করেন অর্থমন্ত্রী। অঙ্গনওয়াড়ি ও আশা-কর্মীদের জন্য ৫০০ টাকা করে ভাতা বৃদ্ধির প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। পঞ্চায়েত ভোট আসন্ন, তাই হয়তো তুষ্ট করার প্রচেষ্টা গ্রামীণ বাংলাকে। অন্যদিকে ভ্যাট (মূল্যযুক্ত কর)-এর ঊর্ধ্বসীমা ১০ লাখ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২০ লাখ টাকা করার কথা বলা হয়েছে এই বাজেটে। এর ফলে নাকি ছোট ব্যবসায়ীরা উপকৃত হবেন। এ এক ভাঁওতাবাজির চূড়ান্ত নির্দেশনা। অনেকেই জানেন বা হয়তো জানেন না যে নতুন কর কাঠামো জিএসটি (গুড্স অ্যান্ড সার্ভিস ট্যাক্স) লাগু হতে চলেছে পুরো ভারতে আগামী ১ জুলাই ২০১৭ থেকে। এই জি.এস.টি কর-কাঠামোতে ইতিমধ্যে ২০ লাখ টাকা উর্ধসীমার উল্লেখ রয়েছে। তাই একটি কেন্দ্রীয় নীতি কীভাবে লাগু হবার আগেই রাজ্যের বাজেটে অংশ করে নিয়ে চমক দেওয়া যায় তা এই ঘোষণা থেকে সুস্পষ্ট।

মধ্যবিত্তদের জন্য অর্থমন্ত্রীর চমক ফ্ল্যাট কেনার ওপর বিভিন্ন ছাড়। স্ট্যাম্প ডিউটি ৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ২ শতাংশ করার প্রস্তাব দিয়ে ও এক বছরের মধ্যে রেজিস্ট্রি করলে ফি-এর ওপর ২০ শতাংশ ছাড় দেওয়া ঘোষণার মাধ্যমে। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়, মধ্যবিত্ত সরকারি চাকুরে, শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের জন্য প্রায় ৫০ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা না পেয়ে ফ্ল্যাট কেনা একটি দুঃসাহসিকতা বাসনা। এইটি যদি অমিতবাবু একটু বুঝতেন, উপরন্তু ষষ্ঠ বেতন কমিশন নিয়ে একটি কথাও নেই। ২০১৫ সালে গঠিত ষষ্ঠ বেতন কমিশনের রিপোর্ট দাখিল করার কথা ২০১৬ সালের ২৬ নভেম্বর। কিন্তু ওই সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করতে না পারায় কমিশনের মেয়াদ এক বছর বাড়ানো হয়েছে। ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার সপ্তম বেতন কমিশনের সুপারিশ কার্যকর করেছে। তাই আশা ছিল অর্থমন্ত্রী তাঁর এই বাজেটে বেতন কমিশন নিয়ে কিছু আশার কথা শোনাবেন। কিন্তু আপামর মধ্যবিত্ত সরকারি চাকুরে বাঙালিদের উনি নিরাশ করলেন।

পেনশন খাতে ও বেতন খাতে বরাদ্দ যথাক্রমে ১৭০০ কোটি টাকা ও ৩৫০০ কোটি টাকা বাড়ানোর প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কোন খাত থেকে এই টাকার সংস্থান হবে তা উল্লেখ নেই এই বাজেটে।

গত বছরের জুলাই মাসে ২০১৬-১৭ অর্থবর্ষের বাজেটে অমিতবাবু ঘোষণা করেছিলেন ১০০ কোটি টাকার ভার্চুয়াল ক্লাসরুমের প্রকল্প। এই প্রকল্পের মাধ্যমে জেলার মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক এবং সরকারি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের আধুনিক শিক্ষার প্রসারের আলোয় আসার সম্ভাবনার কথা শুনিয়ে ছিলেন অর্থমন্ত্রী। গত আট মাসে একটিও ভার্চুয়াল ক্লাসরুম চালু করা যায়নি। খরচ হয়নি একটিও টাকা। শুধু আশ্বাস ও প্রতিচ্ছবি হিসাবে থেকে গেছে সেই ঘোষণা। ঠিক যেমনটি হাজার হাজার প্রকল্পের শিলান্যাসের পাথর সাক্ষী থেকে গেছে বাংলার বুকে না পাবার দৈন্যদশার।

বাজেটের শেষ পর্যায় অর্থমন্ত্রী ঘোষণা করলেন ১৩ লক্ষ কর্মসংস্থানের কথা। কিন্তু উহ্য রাখলেন কোন কোন শিল্পে কতটা কর্মসংস্থান হয়েছে। শ্রম মন্ত্রকের সূত্র অনুযায়ী দেশে ১.৫ লক্ষের কর্মসংস্থান হয়েছে চলতি অর্থবর্ষে। যেখানে শুধু বাংলারই ১৩ লক্ষের কর্মসংস্থান। ভাবা যায়! এদিকে আশ্চর্যজনকহারে বৃহৎ শিল্প প্রকল্পের একটিও কথা নেই এই বাজেটে।

(পুনশ্চ—যাঁরা এই রাজ্যের প্রাত্যহিক খবর রাখেন তাঁরা জানেন যে চপ, আচার, বড়ি শিল্পে আজ বাড়-বাড়ন্ত। হয়তো কর্মসংস্থান এই শিল্পগুলিতে হয়েছে বা হচ্ছে। সেইক্ষেত্রে অর্থমন্ত্রীর হিসাবে কত টন চপ, কত হাজার শিশি আচার ও কত কুইন্টাল বড়ি উৎপাদন হলো, তা বাজেটে উল্লেখ থাকাটা বাঞ্ছনীয়।)

কমিউনিটি শৌচাগার ভেঙে দিল পৌরসভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি ৭ ফেব্রুব্রুয়ারি : মেমারি পৌরসভার মাঠপাড়ার ৫নং ওয়ার্ডটি সিপিআই(এম)-র দখলে। ৫নং ওয়ার্ডটি একটি বস্তি এলাকা এখানে ১০০ পরিবারে প্রায় চারশত মানুষ বসবাস করছেন। ১১টি পরিবার পি.ডব্লিউ.ডি জায়গা দখল করে বাস করছিল প্রায় ৪০ বছর ধরে। ২০১৬ সালে নোটিশ দেওয়া হয়। বস্তি উচ্ছেদ করে ওখানে মোটেল তৈরি হবে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে বস্তিবাসীদের বলা হয়েছিল উপযুক্ত পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে। গত বিধানসভার ভোটের আগে মেমারি পৌরসভার চেয়ারম্যান কথা দিয়েছিলেন 'হাউস ফর অল' প্রকল্পে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের আওতার মধ্যে ঘর করে দেওয়া হবে। ওই ১১টি পরিবারকে একটি জায়গা দেওয়া হয়েছে, তারা নিজেরা ওই জায়গা দখল করে মাথা গোঁজার মতো ঘর করেও নিয়েছেন। সেখানে বিদ্যুৎ ও জলের লাইন এখনও দেওয়া হয়নি। ২০১৬ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি থানায় এসে মেমারি বিডিও, থানার বড়বাবু, পৌরপ্রধান, ডেপুটি পৌরপ্রধান, সিপিআই(এম)-এর ৫নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলার মানু ভট্টাচার্য, ৫নং ওয়ার্ডের সেক্রেটারি পিন্টু ভট্টাচার্য ও ১১ জন বস্তি পরিবারের মানুষজন থানায় বসে আলোচনা হয়। বর্ধমান সদর মহকুমা শাসকের সামনে চেয়ারম্যান কথা দিয়েছিলেন বিকল্প জায়গায় শৌচাগার তৈরি করে দেবার। তারপর এই শৌচাগার ভাঙা হয়। চেয়ারম্যানকে লিখিতভাবে জানানো হলেও চেয়ারম্যান বিষয়টির গুরুত্ব না দিয়ে কাউকে কিছু না জানিয়ে শৌচাগারটি পুলিশের সাহায্যে জে.সি.বি, মেশিন দিয়ে ভেঙে ফেলার ব্যবস্থা করলেন। রাজ্য সরকার যেখানে মিশন নির্মল বাংলা ঘোষণা করছে, সেই সরকারের চেয়ারম্যান এইভাবে ব্যবহায়িত শৌচাগারটি ভেঙে দেওয়ায় ওই এলাকার মানুষ ক্ষোভে ভেটে পড়েন। বস্তি পরিবারের মহিলা ও পুরুষ প্রতিবাদ করতে পারলেন না পুলিশের জন্য। অথচ মেমারি-১ ব্লককে নির্মল ব্লক হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিল গত ১৫ ডিসেম্বর ২০১৬। বস্তি এলাকার গৃহবধূ রেখা রায় বলেন, আমাদের কোনো নোটিশ দেয়নি, না জানিয়ে হঠাৎ পুলিশ নিয়ে এসে চেয়ারম্যানের নির্দেশে জেসিবি মেশিন দিয়ে কমিউনিটি শৌচাগারটি ভেঙে দেল। আমরা এতগুলো পরিবারের মানুষেরা এরপর কোথায় শৌচ করতে যাব। আবার সেই রাস্তার ধার ও রেল লাইনে যেতে হবে।

১০ ফেব্রুয়ারি পরিযায়ী আদিবাসী মহিলা শ্রমিক-এর উপর পাশবিকতার প্রতিবাদে ও দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে মহিলা সমিতির এস.পি-কে ডেপুটেশন।

শিক্ষা ও পরীক্ষা

রাজ্যের বিতর্কিত শিক্ষাবিল—কিছু অভিমত, কিছু প্রশ্ন

সেখ সাইদুল হক

পটভূমি

এই বছর ৯ ফেব্রুয়ারি বিরোধীশূন্য বিধানসভায় পাশ হল 'পশ্চিমবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ (প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণ) বিল' (The West Bengal Universities and Colleges [administration and regulations] Bill, 20016)। এই বিলটি প্রথম বিধানসভায় পেশ হয় গত বছর (২০১৬) ডিসেম্বর মাসের অধিবেশনে। এর বিরুদ্ধে সরব হয় বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠন। বামপন্থী বিধায়কেরা বিলটিকে 'কালা' বিল হিসাবে উল্লেখ করে তাকে বাতিলের দাবি জানায়। কিন্তু শিক্ষামন্ত্রী বিলটি পাশ করাতে উদ্যোগী হলেও দলের মধ্যে সমালোচনা ও 'দিদি'র চাপে ১৬ ডিসেম্বর বিলটি প্রত্যাহার করে নেন। একই রকমভাবে অতীতেও শিক্ষামন্ত্রী দিদির চাপে আর একটি শিক্ষা বিল প্রত্যাহার করে নেন। তা হলো পশ্চিমবঙ্গ উচ্চশিক্ষা সংসদ বিল ২০১৫ (The West Bengal council of Higher Education Bill 2015)। এটি তিনি পেশ করেন ৪ মার্চ ২০১৫-তে। কিন্তু 'দিদি'-র আপত্তি দেখে আর সমস্ত ক্ষেত্রের মতো 'দিদিতন্ত্রের' নিয়ন্ত্রণকে মান্যতা দিয়ে তা প্রত্যাহার করে পরে সংশোধিত আকারে পেশ করেন। বর্তমান বিলের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে।

প্রত্যাহারের নেপথ্যে

প্রথম পেশ করা বিলটিকে প্রত্যাহারের নেপথ্যে নীতিগত কোনো কারণ ছিল না। ওই বিলটির মূলত তিনটি ধারাতে সমস্যায় পড়তেন তৃণমূল নেতৃত্ব। এক, বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ শিক্ষকদের সরকারি চাকুরে (Public Servant) বানাতে চাওয়া। এটা করলে তৃণমূলের যে-সব শিক্ষক-শিক্ষিকা বিধায়ক, সাংসদ, কিংবা পঞ্চায়েত বা পৌর পদাধিকারী হয়েছেন, তা তারা হতে পারবেন না। কেননা পাবলিক সার্ভেন্ট হলে সরকারি চাকুরে বলে গণ্য হবেন এবং তাঁরা সরকারি চাকরিজীবনের মতো নির্বাচনে দাঁড়াতে পারবেন না। তাহলে তৃণমূলের ছোট, মাঝারি, বড় অনেক নেতৃত্বই মুশকিলে পড়বেন। এ তো বামপন্থীরা নয় যে প্রশাসনে না থাকলেও পার্টি ও গণ সংগঠনের কাজ করবেন। তৃণমূলে প্রশাসনের পদ না থাকলে সংগঠনেও অস্তিত্বহীন হয়ে পড়া। দ্বিতীয়ত, প্রথম বিলটিতে বলা ছিল যে কলেজগুলির পরিচালন কমিটির সভাপতি হবেন কোনো শিক্ষাবিদ এবং সরকার তা ঠিক করে দেবে। সমস্যাটা দাঁড়াল, এখন তৃণমূলের অনেকেই (বিধায়ক, সাংসদ হতে পঞ্চায়েত / পৌর পদাধিকারী) বিভিন্ন কলেজের পরিচালকমণ্ডলীর সভাপতি হয়ে আছেন, তাঁদের বেশিরভাগই শিক্ষাবিদ নন। কিন্তু সবাই শিক্ষানুরাগী। ঠিক ভাঙড়খ্যাত আরাবুলের মতো। তারা দিদিকে বোঝালেন এটা হলে কলেজগুলিতে নিয়ন্ত্রণ চলে যাবে। তাই এই ধারা নৈব নৈব চ। তিন নম্বর আপত্তির ক্ষেত্র হল শিক্ষা-শিক্ষাকর্মীদের ক্ষেত্রে বায়োমেট্রিক হাজিরা প্রথার প্রচলন। কলেজ, বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে এমন অনেক শিক্ষাবন্ধু আছেন যাঁরা কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে মুখ দেখিয়ে নানা শিক্ষাসংক্রান্ত (?) কাজে ব্যস্ত থাকেন। তাদের কী হবে? তাই নীতির প্রশ্নে নয়, নিজেদের ফাঁকিবাজির সমর্থনে দিদিকে বোঝালেন— সংগঠনের কাজ তাহলে লাটে উঠবে। তাই ঘুরিয়ে রায় হোক যাতে বামপন্থীদের জব্দ করা যায়। অতএব দিদিতন্ত্র মেনে বিল প্রত্যাহার।

বর্তমান বিলে কী আছে

বিলটির উদ্দেশ্য ও কারণ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে শিক্ষাক্ষেত্রে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির শিক্ষার আরও উন্নয়ন ঘটাতে এবং পরিচালক, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের কাজের দায়বদ্ধতা, স্বচ্ছতা সুনিশ্চিত করতে এই বিল আনা হয়েছে। এখন দেখা যাক বিলে কী বলা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, কলেজ-পরিচালন সমিতির সভাপতি কে হবেন তা রাজ্য সরকার ঠিক করে দেবে। তিনি শিক্ষাবিদ বা শিক্ষানুরাগী হলেই চলবে। পরিচালন সমিতির সদস্যসংখ্যা ঠিক করে দেওয়া হয়েছে। পূর্বে চারজন শিক্ষক প্রতিনিধি ও দুইজন শিক্ষাকর্মী প্রতিনিধির কথা বলা হলেও বর্তমান বিলে উভয় ক্ষেত্রে একজন করে কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, উচ্চশিক্ষা সংসদের একজন প্রতিনিধি কলেজ পরিচালন সমিতিতে যুক্ত হবেন। ওই শিক্ষাসংসদের মাথায় আইন সংশোধন করে বসে আছেন স্বয়ং শিক্ষামন্ত্রী। বিলে বলা হয়েছে, রাজ্য সরকার যে-কোনো সময় এই পরিচালন সমিতি ভেঙে দিতে পারবে। বলা হয়েছে, প্রতি বছর শিক্ষক ও কর্মচারীদের জন্য এ সি আর এবং পারফরম্যান্স অ্যাপ্রোভাল রিপোর্ট জমা দিতে হবে। কলেজ সার্ভিস কমিশন কোনো নাম সুপারিশ করলেই নিয়োগ চূড়ান্ত হবে না। সার্ভিস কমিশন প্রয়োজনে নাম প্রত্যাহার করতে পারবে। অর্থাৎ সরকার উপযুক্ত মনে করলে তবে নিয়োগ। বিলে বলা হয়েছে শিক্ষক/শিক্ষিকারা যেমন স্বেচ্ছামূলক বা পারস্পরিক বদলির জন্য আবেদন করতে পারবে তেমনি সরকার চাইলে জনসেবার স্বার্থে যে-কোনো শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মী বা গ্রন্থাগারিককে এক কলেজ হতে অন্য কলেজে বদলি করতে পারবে। এখন থেকে পি.এফ-র টাকাও থাকবে সরকারি ট্রেজারিতে।

বিল সম্পর্কে কিছু অভিমত

এতদিন সংশ্লিষ্ট কলেজ পরিচালনমণ্ডলীর সদস্যরা কলেজ গভর্নিং বডির সভাপতি ঠিক করতেন। এখন শাসক দল চাইছেন পছন্দের ব্যক্তিকে পরিচালন সমিতির মাথায় বসাতে। আগে অধ্যক্ষ সভা ডাকতেন। এখন বলা হচ্ছে সভাপতির নামে সভা ডাকতে হবে। কেন? যাতে মনোনীত সভাপতির নিয়ন্ত্রণ বাড়ে। অর্থাৎ ঘুরিয়ে 'দিদিতন্ত্র' কায়েম হয়। পরিচালন সমিতিতে একজন করে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর সংখ্যা কমানো হল। অথচ এরা ওই অংশ দ্বারা নির্বাচিত হয়। অপরদিকে মনোনীত সদস্যসংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে যাতে শাসক দলের প্রতিনিধিরা নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারে। পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির স্ট্যাটুট অনুযায়ী পরিচালন সমিতিগুলিও পরিচালিত হতো। এখন সরকার যা ঠিক করবে তাই হবে। সরকার মনে করলে যে-কোনো সময় পরিচালন সমিতি ভেঙে দিতে পারবে। কেন এই অগণতান্ত্রিক বিধি থাকবে? এখন হতে সরকারের মর্জিমাফিক কলেজ চালাতে হবে। নাহলে ভেঙে দেওয়া হবে। বলা হয়েছে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের সম্পত্তির হিসাব দিতে হবে। এ পেশার সাথে যাঁরা যুক্ত তাঁরা নিয়ম মেনে ট্রাস্টের রিটার্ন দেন। তাহলে এই বিধি কেন? প্রাইভেট টিউশনি বা অন্য কোনো কারণে আয়ের সঙ্গে সম্পত্তিবিহীন সম্পদ যদি কেউ করেন তা ধরার জন্য সরকারের হাতে ইতিমধ্যে আইন আছে। তাই মুষ্টিমেয় কয়েকজনের জন্য কেন সকলকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হবে। এটা এক ধরনের অমর্যাদা। স্বেচ্ছামূলক বা পারস্পরিক বদলি ভালো, এটা হওয়া উচিত। কিন্তু কেন সরকার জনসেবার নামে জোর করে বদলি করবে? শিক্ষকমণ্ডলী তো সরকারি কর্মচারী নয়। তাদের নিয়োগকর্তা পরিচালন সমিতি। তাহলে সরকার কীভাবে করবে। এটা শুধু অগণতান্ত্রিক নয়, স্বৈরাচারী পদক্ষেপ হবে। রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে চাইবে। নিয়োগের মাপকাঠি হবে মেধা। সেইজন্যই কলেজ সার্ভিস কমিশন বাম আমলে গঠন হয়েছিল। তাদের সুপারিশ মানা বাধ্যতামূলক ছিল। এখন যা বলা হয়েছে তাতে নিয়োগে অস্বচ্ছতা বৈধতা পাবে। কলেজ সার্ভিস কমিশন গুরুত্ব হারাবে। হাজিরার ক্ষেত্রে বায়োমেট্রিক কথাটি না থাকলেও শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন হাজিরাকে কঠোর করা হবে। শিক্ষা সচিবকে ভার দেওয়া হয়েছে পদ্ধতি প্রকরণ বের করার জন্য। শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মীদের নিয়মিত হাজিরা দিতে হবে। এ বিষয়ে কোনো প্রশ্ন নেই। অধ্যক্ষকে সেইমতো স্ট্যাটুট ক্ষমতা দিয়েছে। এখন আমলা মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করতে চাওয়ায় রবীন্দ্রনাথের তোতাকাহিনী মনে পড়ে যাচ্ছে। খাঁচাটা ঠিক থাকতে হবে, পাখি মরুক ক্ষতি নেই।

শিক্ষামন্ত্রীর যুক্তি

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির স্বাভাবিকের দাবির প্রশ্নে বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী এক সময় বলেছিলেন, সরকার টাকা দেয় তাই সরকার মাথা গলাবে— বেশ করবে। ঠিকই তো। কার টাকা কে দেয়। তাহলে তো ইউজিসি একই কথা বলবে। এখন আবার দুষ্ট গরু, শিষ্ট গরুর কথা তুলেছেন। ঠিকই। এমন রাখাল না হলে কেউ একথা বলে? যা হোক বিলের সপক্ষে ব্যাখ্যা দিতে চেয়ে তিনি বলেছেন সরকারি নিয়ম নামে কোনো বিশ্ববিদ্যালয় ৬ কোটির ভবন তৈরি করেছে, কেউ ৭০০ কোটি ফিক্সড ডিপোজিট করেছে, কেউ দীর্ঘদিন অডিট করায়নি, দিনের পর দিন রেজাল্ট বের হচ্ছে না, ছাত্র ভর্তির ক্ষেত্রে সংরক্ষণ মানা হচ্ছে না, কিছু কলেজে আর্থিক নয়ছয় হচ্ছে, নিয়োগে বেনিয়ম হচ্ছে, মহিলাদের প্রতি অশালীন আচরণ হচ্ছে, বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে শূন্যপদ পড়ে থাকছে। তাই নাকি সরকারি নিয়ন্ত্রণ বাড়াতে হবে।

যুক্তির অসারতা

এসব কথা শুনলে ঘোড়াতেও হাসবে। এগুলি যুক্তিহীনের যুক্তি। এসব কেন হচ্ছে সে জবাব তো সরকারকেই (মন্ত্রীকেই) দিতে হবে। ছয় বছরের বেশি সরকারে আছেন। স্থায়ী উপাচার্যের পরিবর্তে অস্থায়ী উপাচার্য চলছে। কাদের করা হচ্ছে? যেসব বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজে এসব হয়েছে মন্ত্রী খোঁজ নিলেই জানতে পারবেন কারা ওই কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পরিচালনায় যুক্ত ছিলেন। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের কথাই ধরুন না। একটু অনুসন্ধান করলে আপনি যা বলছেন তা এখানে গত পাঁচ বছর হয়েছে কিনা? তলে কেন হয়েছে? কারা করেছেন? কিংবা রাজকলেজের কথাই ধরুন, সেখানে কি হয়েছে?

কিছু প্রশ্ন

মন্ত্রী এবং তাঁর শিক্ষা বিলকে যাঁরা সমর্থন করছেন তাঁদের কাছে বিনীত প্রশ্ন— তাঁরা কি খোঁজ নেবেন কেন শিক্ষা ক্যাম্পাসগুলি শাসকদলের মন্ত্রী, বিধায়ক, সাংসদদের দখলদারির শিকার হচ্ছে? কেন এখানে নৈরাজ্য? কেন শিক্ষক শিক্ষাকর্মী, কিংবা ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর নজিরবিহীন সন্ত্রাস? কেন নির্বাচিত প্রতিনিধি অপেক্ষা মনোনীতদের উপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে? কেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আজ রণক্ষেত্রের চেহারা নিচ্ছে? পিছনে কারা একটু খোঁজ নিয়ে বলুন।

উপসংহার

এককথায় বলা যায় এটা একটি কালা বিল। সরকারের স্বৈরাচারী পদক্ষেপের নমুনা। এই সরকার আর.এস.এস-এর জুতো পায়ে গলিয়ে শিক্ষায় পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতে চাইছে। এ বিলে শুধু শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মীরা নন, ক্ষতিগ্রস্ত হবে উচ্চশিক্ষার ভবিষ্যৎ। এর বিরুদ্ধে তাই গণতন্ত্রকামী সকল মানুষকে পথে নামতে হবে।

প্রসঙ্গ শিক্ষা—একটি আলোচনা

রণজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

আমরা প্রায়শই বলি যে শিক্ষার মান নিম্নমুখী। আমাদের রাজ্যে পাঠক্রমের মান অনেক উন্নত কিন্তু সিলেবাসের বোঝা এতটা বেশি যে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা একে সঠিকভাবে অনুসরণ বা রপ্ত করতে পারে না। প্রাথমিক স্তর থেকে অঙ্ক ও ইংরাজি এই দুটি বিষয়ে ছাত্রছাত্রীদের ভীতি দেখা যায়। এই বিষয়গুলিতে আমরা গুরুত্ব সহকারে পাঠদান না করে গতানুগতিক পদ্ধতিতে পাঠদান করি, ফলে উচ্চতদর শিক্ষার ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীরা অনেকটা পিছিয়ে থাকে।

আমাদের দেশে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু হয় ১৮১৩ সালে, যখন ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে শিক্ষার দায়িত্ব নেওয়ার নির্দেশ দেয়। ১৮২২ সালে টমাস মনরো শিক্ষা প্রসারের জন্য প্রথম সমীক্ষা করেন। স্বাধীনতার পর শিক্ষার উন্নয়নের লক্ষ্যে ভারতে অনেকগুলি শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়েছে। ১৯৪৮ সালে গঠিত রাধাকৃষ্ণন কমিশন এবং ১৯৬৪ সালে গঠিত কোঠারী কমিশন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে ২০১৬ সালে শিক্ষানীতির খসড়া প্রকাশিত হয়েছে এবং পর্যালোচনা চলছে।

'ছাত্রের থেকে ছাত্রের বইপত্রের ওজন বেশি'— একথা বলা হয়। এটা সত্য না হলেও বইপত্রের ভার তুলনামূলকভাবে বেশি; এটা কমানো দরকার। বিভিন্ন বিজ্ঞাপন আর শিশুবিজ্ঞানের বিভিন্ন তত্ত্বাঠাসা পাঠপ্রণালীর সবটুকু আমাদের শিশুরা গ্রহণে সমর্থ কিনা তা ভেবে দেখার সময় এসেছে। অধিক কোন কিছুই ভালো না, পরিমিতিবোধ দরকার। পঞ্চাশ দশকে আমরা প্রধানত মাতৃভাষা ও পাটিগণিত প্রাথমিক স্তরে শিখতাম। পরে ভূগোল, ইতিহাস ও প্রকৃতিবিজ্ঞানের সাধারণ বিষয় চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত পড়ানো হতো। পঞ্চম শ্রেণিতে ইংরাজি শুরু হয়। ইংরাজি শিক্ষা ছিল বাংলা থেকে ইংরাজি অনুবাদভিত্তিক এবং গ্রামার-নির্ভর। বর্তমানে লার্নিং ইংলিশ-এর (Bliss & Blossoms) প্রবর্তন হয়েছে। সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বাংলা বা ইংরাজি কোনো স্তরেই মান উন্নত হয়েছে একথা বলা যায় না, ভাষাশিক্ষার সমস্যা বর্তমান। এই বিষয়ে গভীর চিন্তা ভাবনার দরকার।

পরিসংখ্যান অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে মাধ্যমিক / উচ্চমাধ্যমিক স্তরে গড়ে ৮৫ শতাংশ ছাত্রছাত্রী টিউশন-নির্ভর। সিলেবাসের বোঝা ছাড়াও বিদ্যালয়স্তরে শিক্ষকের অভাব, ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত প্রভৃতি শিক্ষারমানকে নিম্নগামী করে, ফলে ছাত্রছাত্রীরা টিউশন নিতে বাধ্য হয়। প্রাথমিক স্তর থেকে টিউশন নির্ভরতা এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে ছাত্রছাত্রীরা আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে। টিউশন ছাড়া তারা পরীক্ষায় পাশ করতে পারবে না বা ভালো ফল করতে পারবে না এই ধারণা তাদের পেয়ে বসে। অভিভাবকরাও আরও ভালো ফলের আশায় একাধিক টিউশন দেওয়া প্রয়োজন মনে করেন এবং অকাতরে অর্থব্যয় করতে কুণ্ঠিত হন না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে টিউশন বিষয়টি স্ট্যাটাস সম্পর্কিত হয়ে যায়।

মাধ্যমিক স্তরের পরই যেহেতু উচ্চশিক্ষার আঙ্গিনায় প্রবেশ ঘটে তাই এই স্তরে পরীক্ষার ফল যাতে ভালো হয় সেজন্য প্রথম থেকেই ছাত্রছাত্রীরা উদ্যোগী হয়। মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা বিভিন্ন প্রাইভেট টিউটরের কাছে নাম নথিভুক্ত করে এবং পড়াশুনা শুরু করে দেয়। তাদের পড়াশুনা শুরু হয় এপ্রিল মাসে কিন্তু উচ্চমাধ্যমিকে ভর্তি হয় জুন মাসে। প্রাইভেট টিউশন নির্ভরতা কতটা তা এ থেকে বোঝা যায়। বর্তমানে শুধুমাত্র দ্বাদশ শ্রেণির সিলেবাসের উপর উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা গ্রহণ করার ফলে ছাত্রছাত্রীদের উপর চাপ কিছুটা কমেছে। উচ্চমাধ্যমিক স্তরের স্কুলগুলিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস-এর প্রয়োজনীয় বন্দোবস্ত নেই। অনেকক্ষেত্রে প্র্যাকটিক্যাল না করিয়েই খাতা লিখিয়ে দেওয়া হয়—এই অভিযোগও আছে। এই ধরনের ছাত্রছাত্রীরা পরবর্তীকালে বিজ্ঞান বিষয়ে বিশেষ সুবিধে করতে পারে না। উচ্চমাধ্যমিক স্তরে বিষয় নির্বাচনে নিয়ন্ত্রণ নেই। বেশি নম্বর পাওয়ার জন্য ছাত্রছাত্রীরা এমন এমন বিষয় নির্বাচন করে যেগুলি পারস্পরিকভাবে প্রাসঙ্গিক নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বাংলা, ইংরাজি, জীববিদ্যা, পুষ্টিবিজ্ঞান ও সংস্কৃত নিয়ে যে ছাত্রছাত্রীরা উচ্চমাধ্যমিকে পাশ করবে তাকে বিজ্ঞানের / কলাবিভাগের ছাত্র-ছাত্রী বলা হবে? সুতরাং বিষয় নির্বাচনে নিয়ন্ত্রণ দরকার। উচ্চমাধ্যমিকে বিষয় নির্বাচনের আগে ছাত্রছাত্রীদের কাউন্সেলিং পদ্ধতির সাহায্য নিলে সমস্যা কিছুটা কমতে পারে।

কলেজস্তরে শিক্ষার হাল খুবই করুণ। ছাত্রছাত্রীদের ক্লাসে উপস্থিতির হার বেশ কম। মহিলা কলেজে ক্লাসে উপস্থিতির হার কিছুটা বেশি হলেও গ্রামাঞ্চলের কলেজগুলিতে ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতির হার খুব কম। শিক্ষাবর্ষের শুরুতে মাসখানেক ছাত্রছাত্রীদের ক্লাসে উপস্থিতি কিছুটা

—এরপর চারের পাতায়

পেঁয়াজ বীজ কৃষকদের

—প্রথম পাতার পর

রাজ্যের মানুষকে। তবে শীতকালীন পেঁয়াজ-এর পাশাপাশি বর্ষাকালীন পেঁয়াজ চাষও শুরু হয়েছে পরীক্ষামূলকভাবে কালনায়। এবারকার উৎপাদিত বর্ষার পেঁয়াজ জানুয়ারি মাস থেকেই বাজারে পাওয়া যাচ্ছে। যা ভিন রাজ্যের পেঁয়াজ-এর থেকে দাম অনেক কম। বর্ষার পেঁয়াজ কৃষকদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠলে বাংলাকে আর ভিন্ন রাজ্যের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে না। এ কথা বলছেন অভিজ্ঞমহল। এতে বাংলার মানুষ যেমন উপকৃত হবেন, পাশাপাশি একটু অক্সিজেন পাবেন। কারণ বহুজাতিক সংস্থাগুলি বীজের দাম নির্ধারণ করে খেয়ালখুশি মতো। কালনার পেঁয়াজ চাষে সে সুযোগ নেই। তাই কৃষকরা মাঠে মাঠে পেঁয়াজ বীজ চাষ করছেন। এখন মাঠ ভর্তি পেঁয়াজ ফুল। বাংলা চৈত্র মাসে এই ফুল পেকে গিয়ে বীজ পাওয়া যাবে। পরে এই বীজ থেকে চারা তৈরি করে জমিতে রোপন করা হবে।

জেলা বইমেলা ধাত্রীগ্রামে

—প্রথম পাতার পর

আলমগীর সাত্তার বলেন, ‘‘আমিও একসময় কলেজে পড়াশোনা করতাম। ছাত্র রাজনীতিতে নেতৃত্ব দিতাম, কোনো সময় এখনকার মত পরিবেশ তৈরি হয়নি। এখন ছাত্ররা শিক্ষক বা কোনো গুরুজনকে সম্মান দেয় না। শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্য তৈরি করে। এসব বন্ধ না করলে শিক্ষার উন্নতি হবে না।’’ বইমেলা নিয়ে যুক্তি-তর্কের ঝড় ওঠে। বর্ধমান জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক সুমন্ত ব্যানার্জী এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন—এবারকার বইমেলার মতো বইমেলা আর কোনদিন নাকি হয়নি। কারণ হিসাবে তিনি এক অদ্ভুত যুক্তিকে সামনে এনে বলেন— অন্যান্য বইমেলায় ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে মিছিল হয় বইমেলার দিন বা আগের দিন। সেই মিছিল এবার হল বইমেলার দুদিন আগে। মেলা উদ্বোধনে সাহিত্যিক না থাকার কথাটাও স্বীকার করে নেন।

কবাডি ও খো-খো প্রতিযোগিতা

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ১১ ফেব্রুয়ারি : মেমারি ফুটবল এ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে মেমারি বালিকা বিদ্যালয়ে সকালে এক দিনের কবাডি ও খো-খো খেলার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল। বিভিন্ন স্কুল থেকে স্কুলের ১৩টি দল, মোট ১৯৫ জন ছাত্র/ছাত্রী প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন মেমারি পৌরসভার উপপৌরপ্রধান সুপ্রিয় সামন্ত। মেয়েদের খো-খো খেলায় চ্যাম্পিয়ন হয় মোহন বিদ্যালয়। ছাত্রদের কবাডি খেলায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছে অকালপৌষ বিদ্যালয়, কালনা। খেলা শেষে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন দুলাল করগুপ্ত। বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন ক্লাবের সম্পাদক অশোক চৌধুরী

শপথ নিল দুর্গাপুরের মানব-বন্ধন

—প্রথম পাতার পর

অর্থনীতিতে। সি.আই.টি.ইউ. যে লড়াই শুরু করেছিল, আজ ট্রেড ইউনিয়ন সমূহের যৌথ আন্দোলনে পরিণত হয়েছে, দুর্গাপুরের সমস্ত অংশের মানুষের জীবন-জীবিকা বাঁচানোর লড়াই-এর রূপ নিচ্ছে।

মানব-বন্ধন কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সি.আই.টি.ইউ-এর বর্ধমান জেলার সভাপতি বিনয়েন্দ্রকৃষ্ণ চক্রবর্তী, আই.এন.টি.ইউ.সি-এর বর্ধমান জেলার সভাপতি বিকাশ ঘটক, দুর্গাপুর (পূর্ব) এর বিধায়ক সন্তোষ দেবরায়, শ্রমিকনেতা রথীন রায়, বিশ্বরূপ ব্যানার্জী, মলয় ভট্টাচার্য, বিজয় সাহা, নির্মল ভট্টাচার্য, সুবীর সেনগুপ্ত, নিমাই ঘোষ, জীবন আইচ, উমাপদ দাস, অনীত মল্লিক, সহ বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ। মানব-বন্ধন চলাকালীন বিভিন্ন জায়গায় দুর্গাপুর বাঁচাতে, অ্যালয় স্টিল প্ল্যান্ট সহ সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা রক্ষার লড়াই-এর জন্য সব ধরনের আত্মত্যাগ করার শপথ-বাক্য পাঠ করানো হয়।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার প্রশাসনিক দপ্তরের সামনে গত ৮ ফেব্রুয়ারি হিন্দুস্থান স্টিল এমপ্লয়িড ইউনিয়ন (সি.আই.টি.ইউ) আই.এন.টি.ইউ.সি, এ.আই.টি.ইউ.সি, এ.আই.ইউ.টি.ইউ.সি, স্টিল এমপ্লয়িজ ফোরাম— লাইসেন্সিং অ্যাসোসিয়েশনের যৌথ আহ্বানে অবিলম্বে জমি-মাফিয়াদের হাত থেকে দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার জমি উদ্ধার করে চাকুরিরত ও অবসরপ্রাপ্ত সমস্ত ধরনের ইস্পাত ও আনুষঙ্গিক শ্রমিক- কর্মচারিদের সমবায় প্রথায় জমির লিজিং, কোয়ার্টার লিজিং-লাইসেন্সিং, এন.জি.সি.এস. অনুসারে প্রাপ্য হাউস রেন্ট আলাউন্স, একতরফা ভাবে লাইসেন্সিং ঘরের ফি বৃদ্ধি প্রত্যাহার ও সুষ্ঠু নাগরিক পরিষেবার দাবিতে এক বিশাল জমায়েত হয়। বক্তব্য রাখেন স্বপন মজুমদার, সুব্রত ভট্টাচার্য, শম্ভু প্রমানিক, বিশ্বনাথ মণ্ডল, সুরেশ মুখার্জী ও স্বপন মুখার্জী। দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার সি.ই.ও দপ্তরে স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়।

৯ ফেব্রুয়ারি, হিন্দুস্থান স্টিল এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন (সি.আই.টি.ইউ)-এর ডাকে দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার ই.ডি দপ্তরে অবিলম্বে বকেয়া বেতন চুক্তি করার জন্য সেইল-এর এন.জি.সি.এস.-এর আলোচনা শুরু ও বিগত এন.জে.সি.এস-এর বেতন চুক্তি অনুসারে প্রাপ্য বকেয়া মেটানোর দাবিতে শ্রমিকরা বিক্ষেভ দেখান। ইউনিয়নের পক্ষ থেকে স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়।

প্রসঙ্গ শিক্ষা—একটি আলোচনা

—তিনের পাতার পর

বেশি হলেও পুজোর পর ক্লাসে উপস্থিতির হার তলানিতে পৌঁছে যায়। অবশ্য এর কারণ একাধিক—বাসস্থানের দূরত্ব, অনেকক্ষেত্রে যাতায়াতের খরচ, অধ্যাপকের অনুপস্থিতি বা অন্য কারণে ক্লাস না হওয়া, উপস্থিতির হার শূন্য শতাংশ হলেও বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিতে কোনো অসুবিধা না হওয়া ইত্যাদি। এছাড়া পাঠ্যবিষয়কে ছাত্রছাত্রীদের উপযোগী করে উপস্থাপন করার ক্ষেত্রে অনেক অধ্যাপক /অধ্যাপিকার অনীহা। গতানুগতিকভাবে পাঠদান যা ছাত্রছাত্রীদের আকর্ষণ করে না। লক্ষ্যণীয় বিষয় যে, যে সমস্ত শিক্ষকরা পাঠদানে আন্তরিক এবং প্রকৃতই ছাত্রছাত্রীদের জন্য সদা সচেষ্ট তাদের ক্লাসে আজও ছাত্রছাত্রীরা উপস্থিত থাকে। ছাত্রছাত্রীদের কাছে টিউশনের গুরুত্ব প্রধান তাই ক্লাসে আসার প্রয়োজন তারা অনুভব করে না।

উচ্চশিক্ষায় কলেজস্তরে এবং কিছু কিছু বিষয়ে স্নাতকোত্তর স্তরে টিউশন নির্ভরতা ক্রমবর্ধমান। কারণ সময়াভাবে সিলেবাস শেষ না হওয়া, পর্যাপ্ত সংখ্যক শিক্ষক না থাকা এবং নিয়মিত ক্লাস না হওয়া। অনার্স বিষয়ে এবং বর্তমানে জেনারেল কোর্সেও টিউশন নির্ভরতা দেখা যাচ্ছে। অবজেকটিভ টাইপ প্রশ্নের উত্তর করার জন্য ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যবই ভালো করে পড়া দরকার। কিন্তু অবজেকটিভ প্রশ্নের সাজেশন পাওয়ায় ছাত্রছাত্রীরা পাঠ্যবই বিস্তারিতভাবে পড়ছে না। MCQ-এর আধিক্য হওয়ায় ছাত্রছাত্রীদের কোনও বিষয়ে বর্ণনামূলক লেখার দক্ষতা কমে যাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়স্তরে নতুন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পরিকাঠামো সঠিকভাবে গড়ে ওঠেনি এবং অবশ্যই তা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। পঠনপাঠনের মানের সাথে তা সম্পর্কিত।

শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নে কয়েকটি প্রয়োজনীয় বিষয় :

১) বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো, পানীয় জল ও শৌচালয় নির্মাণে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ।

২) ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত যথাযথ (১ ঃ ৩০) হওয়া দরকার, তাহলে শিক্ষকরা প্রতিটি ছাত্রকে লক্ষ্য রাখতে পারবেন।

৩) প্রাথমিক বিদ্যালয়ে NCTE নিয়ম মেনে শিক্ষক /শিক্ষিকা নিয়োগ।

৪) শিক্ষণ দিবস (Teaching Days) পর্যাপ্ত হতে হবে।

৫) বিদ্যালয়ভবনকে অন্যভাবে ব্যবহার বন্ধ করতে হবে।

৬) মিড-ডে-মিলের ব্যবস্থায় শিক্ষকদের বাদ দিয়ে সরকারি স্তরে অন্যভাবে ব্যবস্থা করতে হবে (শিক্ষকরা পাঠদানে মনোযোগ দিতে পারবেন)।

৭) শিক্ষকদের শিক্ষা ছাড়া অন্য প্রয়োজনে ব্যবহার বন্ধ করতে হবে।

৮) পাঠক্রমকে সময় উপযোগী করে পাঠ্যবইকে সুন্দর ও আকর্ষণীয় করতে হবে।

৯) প্রাথমিক স্তর থেকেই মাতৃভাষা ও ইংরাজি শিক্ষায় বিশেষ জোর দিতে হবে।

১০) পাঠদান এমনভাবে করতে হবে যাতে ছাত্রছাত্রীদের প্রাইভেট টিউশন না দিতে হয়।

বিদ্যালয়স্তরে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক দেওয়ার সরকারি ব্যবস্থা আছে। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে সকল শ্রেণির গরিব ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে পাঠ্য বই দেওয়ার ব্যবস্থা করা ও ছাত্রবৃত্তি বৃদ্ধি করা দরকার।

ক) কলেজ স্তরে শিক্ষণ দিবস পড়াতে হবে এবং সিলেবাস অবশ্যই শেষ করতে হবে, ছাত্র অনুপাতে অধ্যাপক নিয়োগ ও শিক্ষাকর্মী নিয়োগ করতে হবে।

খ) গ্রন্থাগারের উন্নয়ন দরকার যাতে ছাত্ররা তা ভালোভাবে ব্যবহার করতে পারে। বইয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি e-book-এর ব্যবস্থা, Xerox-এর ব্যবস্থা, e-learning-এ উৎসাহিত করা ইত্যাদি। লাইব্রেরিতে কাজের সময় (working hours) বাড়াতে হবে।

গ) College website ব্যবহার করে প্রয়োজনীয় পাঠ্যবিষয় upload করে দিতে হবে, প্রয়োজনমতো ছাত্ররা যেন তা download করে নিতে পারে। পাঠ্যবিষয়ের উপর প্রশ্নোত্তর পর্ব থাকা দরকার। যেখানে ছাত্ররা তাদের প্রশ্নের উত্তর শিক্ষকদের কাছ থেকে জেনে নিতে পারবে। কলেজে পঠন-পাঠনের উপযোগী পরিবেশের দিকে নজর দিতে হবে এবং সঠিক সময়ে পরীক্ষা গ্রহণ ও নির্ভুল ফলপ্রকাশ করা দরকার।

‘দেশ’ পত্রিকা ২ জানুয়ারি ২০১৭ সংখ্যায় কুণাল চট্টোপাধ্যায়ের একটি লেখা উল্লেখ করে বলা যায় ‘শিক্ষায় চাই সততা’। শিক্ষকতা শুধু পেশা নয়, নিজের অধীতবিদ্যা উজাড় করে দেওয়ার মানসিকতা। স্নেহ ভালোবাসা ও সহানুভূতির সঙ্গে ছাত্র/ছাত্রীদের সমস্যাগুলি বোঝা ও সমাধান করা হলে শিক্ষার মানোন্নয়ন ঘটবেই। শিক্ষায় শুধুমাত্র পাঠ্যবই, বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ, পোশাকপত্র, মিড-ডে-মিল, সবুজ সাথীর সাইকেল পর্যাপ্ত নয়, এর সাথে সাথে সত্যিকারের শিক্ষাটাও দরকার যা থেকে আমরা এখন অনেকটাই পিছিয়ে। শিক্ষা নিয়ে অনাবশ্যক পরীক্ষা-নিরীক্ষার অবসান দরকার। প্রতিযোগিতা সর্বকালের ছাত্রছাত্রীর মান উন্নয়নে, উৎকর্ষ বাড়াতে সাহায্য করে। আজকের দিনেও শিক্ষকরাই পারেন শিক্ষাকে সঠিকভাবে চালনা করতে।

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১। বিজ্ঞানী যোসেফ প্রিস্টল, মৃত্যু ৬.২.১৮০৪; ২। ১৯২১ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি; ৩। ১৯৪৬ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি; ৪। জাপানী বিজ্ঞানী শিগা কিয়োশি, জন্ম ৭.২.১৮৭১; ৫। সাহিত্যিক নারায়ণ সান্যাল, ২০০৫ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি; ৬। ১৮৭২ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি, আন্দামান জেলে, শের আলি। শের আলির ফাঁসি এইদিনেই হয়; ৭। ১৯৩৪ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি; ৮। সাহিত্যিক ডাঃ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, মৃত্যু ৯.২.১৯৭৯; ৯। ২০১০ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি, বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে, জন্ম ৪.৪.১৯৩৪; ১০। বিজ্ঞানী ভিলহোম কর্ণাড রন্টজেন। মৃত্যু ১০.২.১৯১৮; ১১। বিজ্ঞানী টমাস আলভা এডিসন, জন্ম ১১.২.১৮৪৭; ১২। চার্লস ফিয়ার আন্ডুজ, জন্ম ১৮৭১ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি, ইংল্যান্ডে।

মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে

—প্রথম পাতার পর

বক্তারা।

সেমিনারের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন ড. অপূর্ব মুখোপাধ্যায়। স্বাগত ভাষণ দেন কাটোয়া কলেজের অধ্যক্ষ ড. নির্মলেন্দু সরকার। এই আলোচনাচক্রে কাটোয়া কলেজের ছাত্রছাত্রী ছাড়াও শহরের অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-ছাত্র, শহরের বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। আলোচনাসভাটি সফল করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিনন্দন জানান, অধ্যাপক ড. জ্যোতিপ্রতিম রায়চৌধুরী ও অধ্যাপক উৎপল ঘোষ।

নাম/পদবী পরিবর্তন

● আমি মিনু দাস স্বামী— শম্ভু দাস লক্ষ্মীপুর মাঠ, বর্ধমান এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে আমার স্বামীর প্রকৃত নাম হল শম্ভু দাস। কিন্তু ভোটার পরিচয়পত্রে তার ডাক নাম মনা দাস নথিভুক্ত হয়েছে। আমার কন্যা মুনমুন দাস-এর জন্ম শংসাপত্রেও পিতার নাম হিসেবে মনা দাস নথিভুক্ত হয়েছে। ঘোষণা করছি যে শম্ভু দাস ও মনা দাস এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি বিবেক হোম চৌধুরী পিতা—প্রয়াত প্রফুল্ল কুমার হোম চৌধুরী গির্জাপাড়া, রানিগঞ্জ, বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আসানসোল-এর নিকট ২৩ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে আমার নাম বিভিন্ন নথিতে বিবেকানন্দ হোম চৌধুরী, বিবেক হোম চৌধুরী ও বিবেক চৌধুরী নথিভুক্ত হয়েছে। বিবেকানন্দ হোম চৌধুরী, বিবেক হোম চৌধুরী ও বিবেক চৌধুরী এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

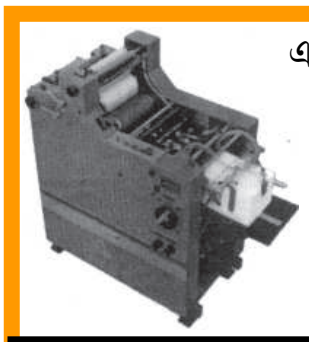

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্‌ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫

Mob. 9434333820, 9635726620 (Fazlul), 8942808557 (Madhu) : E-Mail : sadhanapress09@gmail.com

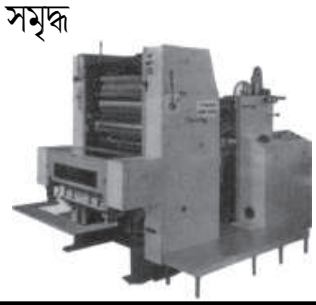

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত।
ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩, ফোন : ২৫৫১৪৫৮। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ২ টাকা